অতীত স্মৃতির কিছু ছোঁয়া প্রেস ক্লাব

এ বি এম মূসা

ঢাকা শহরে ভাড়াবাড়িতে থাকতাম, তারপর নিজ বাড়ি হলো। বাড়ির নাম রিমঝিম। সেই বাড়ির বয়স ৪০ বছর। আমার একটি দ্বিতীয় বাড়ি আছে। তারও একটি নাম আছে। নামটি হচ্ছে প্রেস ক্লাব। সেই বাড়িটির, দালানটির নয়, বয়স হয়ে গেল পঞ্চাশ বছর। সেই পঞ্চাশের দশকের শেষ বা ষাটের দশকের প্রথম থেকে আমরা যারা সাংবাদিকতা করছি, এখনও আল্লাহ হায়াত-দারাজ করায় বেঁচে আছি এবং পরবর্তীতে যারা এসেছে, দ্বিতীয় বাড়ি সবার এই প্রেস ক্লাব। হিসেব করে বলতে পারব না এই সেকেণ্ড হোমে পঞ্চাশ বছরের কতখানি সময় কাটিয়েছি, আর কতখানি থেকেছি নিজের বাড়িতে ও আপন দফতরে। নিজ বাড়ির প্রতিদিনের ক্ষণগুলোর সঙ্গে মিশে আছে প্রেস ক্লাবে কাটানো সময়ের অনেক হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আমোদ-বিবাদের ঘটনাবলী। সবই কি একটি নিবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে তুলে ধরা যাবে? যাবে না, তবে স্মৃতি রোমন্থন করা যাবে কয়েকটি পাতায় অথবা প্যারায়।

প্রথমে চুয়ান্ন সালে যখন সংবাদের সম্পাদক আমাদের অনেকেরই শিক্ষাগুরু খায়রুল কবীর ঢাকায় সাংবাদিকদের জন্যে একটি ক্লাবের কথা বললেন, আমরা প্রথমে তাঁর ধারণার সবটুকু বুঝতে পারিনি। তারপর যখন তাঁর উদ্যোগে একটি লাল সুরকির বাড়িতে প্রথম মিলিত হলাম, তখনও বুঝিনি এই দালানটিই আমাদের মিলনস্থান হয়ে যাবে! খায়রুল কবীর মাসিক এক শ' টাকা ভাড়ায় এই বাড়িটি নিলেন। সেই ভাড়াও কখনও দেয়া হয়নি। অবশ্য অনেক স্মৃতিবিজড়িত সেই লাল ইটের দালানটি নেই। পরবর্তীতে অবিমৃষ্যকারী কোনও ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেটি ভেঙে তথাকথিত আধুনিক কংক্রিটের বাক্স বানিয়েছেন। তবুও কল্পনায় ভেসে ওঠে কাঠের গেটটি পার হয়ে গোলাকার চত্বরটি ঘুরে একটি ছোট্ট হলঘরে ঢুকতাম। আমরা অনেকেই তখন সদ্য সাংবাদিকতার পেশায় ঢুকেছি। সেই যুগে বড়দের সঙ্গে পেশাদারি প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলারই সাহস ছিল না। তাই সেই হলঘরকে এড়িয়ে চলে যেতাম পেছনের উঠানে অথবা দোতলায়। সেই হলঘরে তখন বসে থাকতেন সাংবাদিক জগতের কিংবদন্তির মহাপুরুষরা। অবজারভারের আবদুস সালাম, ইত্তেফাকের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আজাদের আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং তাঁদের চেয়ে একটুখানি বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু ঘনিষ্ঠ দৈনিক সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী ও মর্নিং নিউজের এসজিএম বদরুদ্দিন। তুমুল তর্ক চলত সেই ঘরটিতে, যার আওয়াজ আমরা বাইরে বসে পেতাম। মাঝে-মাঝে উঁকি মেরে দেখতাম বর্ষীয়ানদের উত্তেজিত আচরণগুলো। পরে ভাবতাম লঙ্কাকাণ্ড ঘটছে, কিছুক্ষণ

পরেই দেখতাম একে একে বা জোড়ায় জোড়ায়, কখনও এক সঙ্গে প্রায় গলাগলি করে তাঁরা বেরিয়ে যেতেন।

আমরা ছোটরা তখন কী করতাম? ভাবতে অবাক লাগছে। নিজেদের তখন বয়সে ও পেশার জীবনে কত কনিষ্ঠ ভাবতাম। চুপচাপ দোতলায় উঠে যেতাম, সেখানে তাস খেলতাম অথবা পেছনের উঠানে আম গাছের নিচে কাঠের চেয়ারে বসে গুলতানি মারতাম। শতাব্দী প্রাচীন সেই আম গাছগুলো, বিশেষ করে একটি পেয়ারা গাছের জন্যে এখনও মায়া জাগে। আমাদের মধ্যেও তর্ক-বিতর্ক হতো নানা ধরনের। চা খাওয়া হতো দেদার। প্রথম থেকেই ক্লাবের ক্যান্টিনটি চালু করেছিলেন অবাঙালি পিটিআই প্রতিনিধি বালান সাহেব। এক আনায় মানে ছয় পয়সায় চা, দুই পিস বাটার টোস্ট এক খানা। তখনই চালু হয়েছিল প্রেস ক্লাবের ঐতিহ্যধারী আণ্ডাপুরি। ঢাকায় তখন এই খাবারটির নতুনত্ব এতই প্রচার লাভ করেছিল, বাইরের বন্ধুবান্ধবরা আবদার করতেন, 'দোস্ত, তোদের ক্লাবের আণ্ডাপুরি খাওয়াবি?' দুপুরে ভাত-ডাল-মাছ সঙ্গে ভাজি, দিতে হতো আট আনা, পঞ্চাশ পয়সায় পেটপুরে খাওয়া। রোববারে ফিস্ট, বিশেষ খাওয়া। সবাই আসতাম সপরিবারে, মানে যাদের পরিবার ছিল। বিশেষ খাওয়া পোলাও, মুরগি, ডিম এবং পুডিং মূল্য এক টাকা ২৫ পয়সা মাত্র। মজার ব্যাপার, এখনও এবং তখনও প্রেস ক্লাবে যাওয়া মানেই খাওয়া আর অবসরের আড্ডা।

চমৎকার এসব খাদ্য যারা রাঁধত, তাদের মাঝে ছিলেন রোজারিও। তখনকার দিনে ভাল বাবুর্চিরা সবাই ছিল খ্রিস্টান। এই রোজারিওকে নিয়ে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রায় ২৭ বছর পর আমি কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি গিয়েছিলাম। থাকতাম ইন্টারকন্টিনেন্টালে, খেতাম সব অখাদ্য পাশ্চাত্য খাবার। একদিন ডাইনিং রুমে খেতে বসেছি, এক সাদা চামড়ার বেয়ারা ঢেকে-ঢুকে একটি ট্রে আমার সামনে রেখে গেল। ঢাকনা খুলে দেখি এক প্লেট সাদা ভাত, সঙ্গে গরুর গোস্তের কারি আর একেবারে খাঁটি মসুরের ডাল এক বাটি। অবাক হয়ে বেয়ারার দিকে তাকাতেই সে হেসে দূরে দাঁড়ানো এক জনের দিকে ইশারা করলো। কালো চামড়ার সাদা এ্যাপ্রোন পরা ব্যক্তিটি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। 'স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি এখানকার হেড শেফ, আপনাদের প্রেস ক্লাবে বাবুর্চি ছিলাম। আমি রোজারিও। যেদিন হোটেলে আপনি ঢুকেছেন, সেদিনই দেখেছি। হেড বাবুর্চি হলেও মাঝে মাঝে ডাইনিং রুমে এসে গেস্টদের খাওয়া-দাওয়া দেখি। আপনাকে চিনতে পেরে, আপনার কিছুই না খেয়ে উঠে যাওয়া দেখে ভাবলাম, স্যারের কষ্ট দূর করতে হবে। এখন থেকে রোজ রাতে আপনি ভাত-ডাল-মাছ বা মাংস পাবেন। আমি নিজে আলাদা রান্না করব।' আবেগাপ্লুত হয়ে এক ঘর সাদা চামড়াকে অবাক করে রোজারিওকে জড়িয়ে ধরলাম।

যে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম, তখনকার দিনে ক্লাবের সদস্য আর কর্মীদের মাঝে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের একটি উদাহরণ মাত্র। যার উষ্ণতার ছোঁয়া বিদেশে গিয়েও পেয়েছি। উমিদ খান, আবদুল হক, ফরমান আলী– সব বেয়ারা সিডনির রোজারিওর মতই এমনি দরদ দিয়ে চা'র কাপটি টেবিলে রাখত। বেয়ারা কুদ্দুস সবার ফুটফরমায়েশ খাটতে হয়রান হয়ে যেত। সর্বক্ষণ দৌড়াত বাইরে থেকে সিগারেট আর পানের জন্যে। বলছিলাম সেকেণ্ড হোম, দ্বিতীয়

বাড়ি, এরা সবাই ছিল সেই বাড়ির অন্য বাশিন্দা মালিক সদস্যদের একান্ত আপন। আরেকটি উদাহরণ দেব। পঞ্চান্নের বন্যায় ঢাকা শহর ভেসে গিয়েছিল। আমার শ্বশুর জনাব আবদুস সালাম পরিবারের অন্য সবার সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা আমার স্ত্রীকে নিয়ে প্রেস ক্লাবের দোতলায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে একদিন আমার বড় মেয়ের জন্ম হল। সেই মেয়েকে উমিদ খান কাঁথা দিয়ে বুকে জড়িয়ে বারান্দায় পায়চারি করে কান্না থামাত। কাঁথার ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিত। এখন প্রেস ক্লাবের অডিটোরিয়ামে অনেক বিয়ে হয়। প্রথম বিয়ের আসরটিও হয়েছিল আমার এই মেয়ে রুমার। মানিক মিয়া, সালাম সাহেবেরা এলে আবদুল হক দৌড়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে পায়ের জুতো খুলে মুছে দিত। আর কত নাম বলব, সবার কথা মনে পড়ছে না। এখন যখন সদ্য পেশায় আগত নতুন কোনও সদস্যকে বাচ্চা বেয়ারাদের ওপর হম্বিতম্বি করতে দেখি, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি, কোথায় গেল সেই মধুর সম্পর্ক!

ক্লাবের ঘরোয়া পরিবেশ, সেকেণ্ড হোমের সুইট হোমের সময়ের অনেক বিবরণ হয়তো পুরনো সদস্যদের আরও অনেকেই লিখবেন। বস্তুত এই প্রেস ক্লাবের প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন ও প্রতি বছর নিয়ে সাত কাণ্ড রামায়ণ লেখা যায়। শুধু সাংবাদিকদের বিনোদন কেন্দ্র নয়, এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ক্লাবটির একটি ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। এই দেশের ইতিহাসের অনেক অধ্যায় এ ক্লাবেই লিখিত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যময় সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন কিনা জানি না। এ ক্লাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সভা করে মিছিল নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন নেভাতে বিভিন্ন এলাকায় গেছেন। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে নয় জন রাজনৈতিক নেতা প্রথম একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন বোধহয় বাষট্টিতে। সেই বিবৃতিটির খসড়া করেছিলেন তারা এই ক্লাবের দোতলায়, গোপন সভায় মিলিত হয়ে। ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব, আতাউর রহমান থেকে নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, সব নাম মনে পড়ছে না, সবাই এসেছিলেন সেই সভায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত প্রেস ক্লাবে। সেই সময়ে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই ক্লাবের মিলনায়তনে প্রথম মিলিত হয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে, আজকে সাংবাদিক সমাজের নিজেদের চরম সংকটকালে যখন তাদের প্রাণ ও পেশা হুমকির মুখে, প্রেস ক্লাবের সদস্যদের কোনও প্রতিরোধী ভূমিকা নেই। আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন আগা খান, জেনারেল আজম খান, উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দ। রাজনীতির উত্তাল দিনগুলোতে এই ক্লাব ছিল সবার অভয়াশ্রম, সেফ জোন।

অতীতে ও সাম্প্রতিককালে কয়েক বছর আগেও পুলিশের মার খেয়ে রাজনৈতিক নেতারা এসে এখানে আশ্রয় নিতেন। এখন অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটছে। বাইরের রাজনৈতিক ঝাপটা যাতে ক্লাবে না আসে, বিদ্যমান সংকটকালে রাজনীতিবিদদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্যে, তারা যেন পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ঢুকতে না পারে, সে জন্যে প্রধান গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। আর বন্ধ না করলেই বা কী? পুলিশ ক্লাবের ভেতরে ঢুকে যায়। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। এমনকি সাংবাদিক পিটিয়েছেও। আইয়ুব-মোনেম বা এরশাদ আমলেও ক্লাব ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ। এখন আর তা নেই। সাংবাদিক সমাজের অনৈক্য আজ ক্লাবের নিরাপত্তার পরিবেশটি ধ্বংস করে দিয়েছে, ঐতিহ্য বিনষ্ট করেছে।

রাজনীতির ইতিহাসে অবদান রাখার চেয়েও এ প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের অধিকার আদায় ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে অনেক বেশি। এখান থেকে বয়সের ভারে ন্যুব্জ মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে সব মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক আইয়ুব খানের প্রেস অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে মিছিল করেছেন। আমার ছাদ-খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে মওলানা সাহেব সারা ঢাকা ঘুরেছেন, সেই গাড়িটি চালানোর সুখময় স্মৃতি এখনও আমাকে রোমাঞ্চিত করে। সাংবাদিকদের ঐক্যের প্রতীক ছিল এ ক্লাব। চার বার সভাপতি ও তিন বার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিক সমাজের ইউনিয়ন ছিল এ দালানে। এখনও আছে, তবে দ্বিধাবিভক্ত, কর্মকাণ্ডের একতাটি নেই। আমি মনের মাঝে ক্ষোভে দুঃখে জ্বালা অনুভব করি যখন দেখি আমার সেই ইউনিয়নটি, আমি এক কালে যার সভাপতি ও সম্পাদক ছিলাম, ক্লাব কর্তৃপক্ষ তার মধ্যিখানে ভাগ করে দেয়াল তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ ক্লাবে ইউনিয়নের একটি ঘর পেতে আমাকে মালিক ও সম্পাদকের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়েছে। তাদের যুক্তি ছিল ক্লাবটি শুধু পেশাদার সাংবাদিকদের নয়, তাদেরও বটে। এ ক্লাবে পাকিস্তানে প্রথম সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ডের দাবি উঠেছিল। সেই বোর্ডের প্রথম সভাও হয়েছিল বিচারপতি সাজ্জাদ আহমদ জানের সভাপতিত্বে এ ক্লাবের দোতলায় হলঘরে। সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ইউনিয়নের তখনকার সভাপতি পরবর্তীতে ডেইলি স্টারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বন্ধু এসএম আলী, আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক।

আগে বলেছি, আমার ৫০ বছরের সেকেণ্ড হোম নিয়ে ৫০ পাতায়ও বিস্তারিত বর্ণনা করা যাবে না। তাই স্বল্প পরিসরে অতীতের পাতা থেকে ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতির পঙ্‌ক্তি তুলে ধরলাম। সঙ্গে কিছু তির্যক মন্তব্য, বর্তমানের সঙ্গে একটুখানি তুলনা। কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, মাঝে মাঝে টিপ্পনি কেটেছি অতীত ও বর্তমানের প্রেস ক্লাবের একটি খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরতে।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি, দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক